Q.: মডেল সামন্তবাদের ইউরোপীয় পদক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কতটা প্রাসঙ্গিক?

ভূমিকা: ইউরোপীয় সামন্ত ভারতীয় ইতিহাসে কতটা প্রাসঙ্গিক তা বুঝতে গেলে আমাদের অধ্যাপক হরবনস মুখিয়ার মতামত গুলো গভীরভাবে আলোচনা করতে হয়। কেননা তিনিই ইউরোপীয় সামন্ত ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এক পরিষ্কার ধারনা দিয়েছেন। হরবংশ মুখিয়ার প্রবন্ধ 'Was there Fudalism in Indian History?" -তে তাত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক থেকে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ধারণার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও তা বিতর্কের পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলে, যে প্রশ্ন প্রশাসনিক বিষয়কে অতিক্রম করে যা এযাবৎকাল ভারতে সামন্তসমাজ গঠনে প্রতিনিধিত্ব করে আসছিল। সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন কৃষি অর্থনীতির ধারণা তৈরি হয়েছিল, যা মধ্যযুগের ভারতকে মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজ থেকে পৃথক করেছিল। মুখিয়া এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে থাক ঔপনিবেশিক ভারতকে সামন্ততান্ত্রিক বলা যায় না। যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধারণা, যেখানে সামন্ততন্ত্রের নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল প্রভুর উপর সমগ্র কৃষক সমাজের নির্ভরশীলতা। কিন্তু, ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট ছিল স্বনির্ভর অথবা মুক্ত কিংবা স্বাধীন কৃষি উৎপাদন। "মুখিয়ার প্রাথমিক যুক্তি হল যে সামন্ততন্ত্রকে কি স্পষ্টত পুঁজিবাদের মত বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যায়? প্রকৃতপক্ষে মুখিয়া যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা হল সামন্ততন্ত্রের ধারণা মার্কসীয় কল্পনায় পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে এসেছে এবং তা তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রাথমিক উৎপাদক শ্রমিকশ্রেণির উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনকারী হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে। মুখিয়ার মতে সামন্ততন্ত্রের ধারণা একধরনের অর্থনীতি বহির্ভূত বলপ্রয়োগের আকারে পুঁজিবাদের বিপরীত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রকে তার নিজস্ব পরিভাষার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কিন্তু পুঁজিবাদের বিপরীত হিসেবে মনে করা যায়।

মুখিয়া এরপর ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করে তিনি মৌর্যোত্তর যুগের ভারত ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন। এখানে যে কৃষি প্রেক্ষাপট দেখেছেন তাকে তিনি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য, দান করেছেন। যেমন, ১) প্রাকৃতিক সম্পদযুক্ত জমি এবং আপেক্ষিক উন্নত যন্ত্রপাতি এবং কৌশলের দ্বারা পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন। ২) আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র জমি যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের অপচয়কে এড়িয়ে যেতে পারে যেমন ঘটেছিল ইউরোপে। তিনি বলেছেন যে শর্মা এবং যাদব তাঁদের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে এই উপসংহারে এসেছেন যে দাসপ্রথা ভারতে কোন প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাই শুদ্র কৃষক মধ্যযুগীয় ইউরোপের পরাধীন ভূমিদাসদের সমকক্ষ ছিলনা।

৩) জলবায়ুগত কারণে জীবনধারণের নিম্ন মান ।

৪) প্রাক-ঔপনিবেশিক বা প্রাক আধুনিক ভারতে স্বাধীন কৃষি উৎপাদন থাকার কারণ ছিল উৎপাদনের উপায় এবং প্রক্রিয়ার উপর কৃষকদের আধিপত্য। স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর বা কৃষকদের চলাচলের উপর বাধানিষেধ মুখিয়ার মতে, ভারতে তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। জমি বা শ্রমের বাজার না থাকায় কৃষকরা এই আইনত অধিকার ভোগ করত কিনা তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষকদের নিজেদের জমি, লাভল ও শ্রমের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এই কারণেই মুখিয়া স্বাধীন কৃষি উৎপাদনের ধারণা পোষণ করেছেন। কৃষি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন কৃষক ক্রমশ মৌর্যোত্তর যুগে বিবর্তিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের কৃষি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে।যাই হোক অপর বৈশিষ্টা হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন, ৫) সামাজিক স্তরবিন্যাস, বিশেষত জাত ব্যবস্থা প্রাচীন ও মধ্যযুগে এক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে আত ব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল বিশেষত বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের জমি চাষের জন্য কৃষি শ্রমিককে সহজলভ্য করতে।তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে,৬)কৃষকদের চরম দারিদ্রোর সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং ৭) প্রাক আধুনিক যুগে কৃষি অর্থনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখিয়া বলেছেন যে, যখন বৌদ্ধ সাহিত্যে বৃহৎ খামারের কথা বলা হয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রীয় খামারের কথা বলা হয়েছে যেখানে শ্রমিক ও কৃষকরা কর্মরত থাকত, তখন কিন্তু গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগের উপাদানগুলি এই সমস্ত

Pearl coaching center

দীনেশচন্দ্র সরকারের মতামত: ভারতের আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ছক সম্পর্কে ডঃ শর্মা প্রমুখের মতের বিরোধিতা করেছেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবনস মুখিয়া প্রমুখ। অধ্যাপক সরকারের মতে আদি-মধ্যযুগের তাম্র শাসনগুলিতে এমন কোন কথার উল্লেখ নেই, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভূমিদানের ফলে রাজকোষের আয় হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মতে দানগ্রহীতা জমির রাজস্ব ভোগ করতেন কিন্তু কর সংগ্রহের অধিকার বা ক্ষমতা একমাত্র রাজার ছিল। তাছাড়া 'করশাসন' নামক সরকারি আদেশনামার ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে এই সকল আদেশনামা দ্বারা রাজা 'অগ্রহার' এলাকা থেকেও প্রয়োজনে কর সংগ্রহ করতে পারতেন। তাঁর মতে সামন্ত ব্যবস্থার ফলে রাজা বা ভূস্বামীদের তেমনভাবে আর্থিক ক্ষতি ঘটেনি। এই ব্যবস্থায় প্রকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ কৃষকশ্রেণি। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, অধ্যাপক সরকারের মতামত খুব স্পষ্ট নয়। কারণ তিনি সামন্ত রাজাদের fendatory chiefs' এবং অভিজাতদের প্রাপ্ত ভূখণ্ড (ইনাম) কে fief বলে নানা সময়ে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক হরবনস মুখিয়ার মতামত: অধ্যাপক হরবনস মুখিয়া পশ্চিম ইয়োরোপীয় মামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ডঃ শর্মা কথিত ভারত সামন্ততন্ত্রের ধারার তুলনা করে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হল- (১) উৎপাদনের উপকরণের উপর সামন্তপ্রভুর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং (২) চুক্তি। আদি-মধ্যযুগের ভারতে এদুটি উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে উৎপাদনের উপকরণগুলি কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ভূমিদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হত না। এমনকি কৃষক কোনভাবেই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না।

অন্যান্য মতামত: ডঃ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে সপ্তম থেকে এয়োদশ শতকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। ডঃ কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে অষ্টম শতকের আগে পশ্চিম এশিয়ার জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত চলাচল করত। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছানো সহজ হয়। অষ্টম শতকে চীনা জাহাজ গুলো ভারতের কালিকট ও কুইলন বন্দরে আসত। আরব জাহাজগুলিও এখানেই আসত। এখান থেকে চীনা পণ্য আরব জাহাজগুলিতে তোলা হত। এইভাবে ভারতীয় বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য হ্রাস, নগরের অবক্ষয় ইত্যাদি তত্ত্ব দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ শর্মা প্রমুখের যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

উপসংহার: সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। সামন্ততন্ত্রের কালগত কাঠামো এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া এই বিতর্কের সমাধান সম্ভব নয়। তবে সপ্তম শতকে ভারতে ভূমিদান ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমির উপর যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়, তাতে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির পোষণ ঘটা সহয় হয়। আক্ষরিক অর্থে আদি-মধ্যযুগের ভারতে সামন্ত ব্যাবস্থা হয়ত গড়ে ওঠেনি। তবে সেকালে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ ধরে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির যে আবির্ভাব ঘটেছিল, তা বলা সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

Q.: চোল রাজবংশের ইতিহাসে রাজা প্রথম রাজা ও রাজেন্দ্র চোলের তাৎপর্য কী ছিল?

ভূমিকা:চোল রাজবংশের উত্থান দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেবল রাজনৈতিক সংহতি নয়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও চোল রাজাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আদি-মধ্যযুগে ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে চোল বংশ অন্যতম। অশোকের লেখায়, পেরিপ্লাসে, টলেমীর রচনায়, মহাবংশে চোলগণের উল্লেখ আছে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে চোলরাজ কারিকল পেনার ও ভেলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চোল-শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু চের, পাণ্ড্য ও পল্লবদের ক্রমাগত আক্রমণে এক শতকের মধ্যেই চোলরাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। চোলগণ চালুক্য বা পল্লবদের সামন্ত নৃপতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। নবম খ্রিস্টাব্দে পল্লববংশের পতন শুরু হলে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোলবংশের পুনরুভ্যুত্থান ঘটে। এই বংশের দুই শাসক তথা রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল চরিত্র।

খামারের কথা উল্লেখ করেনি। পরিবর্তে সেখানে শূদ্ররা ক্ষুদ্র উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়েছে। অপর বৈশিষ্ট্য হল কৃষির বিস্তার এবং শূদ্রের কৃষকে রূপান্তরিত হওয়া। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরোপুরি খাপ খাওয়ানো যায় না।

Q.: সামন্তবাদ বিতর্কের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ কর

সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত আধুনিক বিতর্ক

প্রারম্ভিক বিতর্ক: ডঃ রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, ডি. এন. ঝা প্রমুখ মনে করেন যে, তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর ভূ সম্পদ দান ব্যবস্থা সপ্তম শতকে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে ধর্মনিরেপক্ষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব হস্তান্তরেরর ঘটনা বৃদ্ধি পেলে সামন্তব্যবস্থার ভিত সবল হয়। ডঃ শর্মা সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ঘটনাকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তার মতে ৩০০- ৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে সামন্তব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ৬০০-৯০০ খ্রীস্টাব্দে সামন্ত ব্যবস্থা ব্যাপকতা পায় এবং ৯০০-১২০০ খ্রী: একদিকে এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জারী হয়। আবার অবক্ষয়ের সূচনা হয়। ডঃ শর্মা পুরাণ গ্রন্থে 'কলিযুগ' সংক্রান্ত বিবরণীটিকে তাঁর মতের সমর্থনে গ্রহণ করেছেন। পুরাণ কথিত চারটি যুগের মধ্যে কলিযুগকে অস্থির, অনিশ্চিত, বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগের কাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীস্টিয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত পুরাণ গ্রন্থে কলিযুগকে যেভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের অস্থিরতার কাল বলা হয়েছে। তাতে সামন্ত ব্যবস্থার আগমনবার্তা শোনা যায় বলে ডঃ শর্মা মনে করেন।

নোবুর কারাশিমার মতামত: পাল প্রতিহারদের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমিদান করলেও ভূখণ্ডের চতুসীমা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা হোত না। এই সুযোগে দানগ্রহীতা জমির চৌহদ্দি বৃদ্ধি করতে পারতেন। এই অতিরিক্ত রাজস্ব ভূস্বামীর আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। নোবুর কারাশিমা ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে চোল যুগে অ-ব্রহ্মদের 'গ্রামগুলি 'উর' নামক গ্রামসভার সমষ্টিগত অধিকারে ছিল। হস্তান্তর-সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দানকর্তা হিসাবে 'উর' এর নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মদএয় গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব ছিল। চোল সম্রাট তৃতীয় রাজরাজের আমলে ব্যক্তিগত ভাবে ভূমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্ন কাবেরী উপত্যকায় জমি ক্রয়- বিক্রয় দলিলে উর-এর নাম নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ঘটনা থেকে দক্ষিণ ভারতের ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আধুনিক মতামত: অষ্টম শতক ও পরবর্তীকালে ভূমিদান ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাবল্য প্রসঙ্গে ডঃ শর্মা ধর্মনিরপেক্ষ ভূ মিদান বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রহার দান ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার সূচনা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসক ও সেনা-কর্মচারীদের রাজস্ব ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হলে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব জোরালো রূপ পায়। অধ্যাপক শর্মার মতে অষ্টম-দশম শতকে বাণিজ্যের সংযোগ ঘটলে মুদ্রা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকারি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল এলাকার উদ্বৃত্ত সম্ভবত রাজকোষে জমা দেওয়া হোত এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব যথাযথ জমা দিতে পারলে এরা নিজ নিজ এলাকার সংগ্রহ করতে পারতেন। ডঃ রণবীর চক্রবর্তীর মতে, "সামন্তদের মধ্যে এক একটি এলাকা বরাদ্দ করে দেবার মধ্যে মধ্যযুগের জায়গীর ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য আছে। গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্যে 'বংশ পোতক ভোগ' অধিকার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগ দখলের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি বিশেষ বংশের ধারাবাহিক কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে শক্তিশালী করেছিল।

প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রি:) :প্রথম রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর নেতৃত্বে চোলরাজ্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় চোলরাজ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 'তাঞ্জোর লিপি' থেকে তাঁর সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। তিনি পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করেন। ফলে মাদুরা তাঁর অধিকারে আসে। তিনি কেরলদেরও পরাজিত করেন। রাজরাজ ছিলেন প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাই তিনি স্থলযুদ্ধের পাশাপাশি জলযুদ্ধের প্রকৃত গুরুত্বও উপলব্ধি করেন ও একটি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। এই নৌবহরের প্রথম সাফল্য হল ত্রিবান্দমের নৌযুদ্ধে চের নৌবাহিনীর ধ্বংসসাধন। রোমিলা থাপারের মতে, রাজরাজ কেরল ও চেরদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। এইজন্য তারা মালাবার উপকূলে আগত আরব বণিকদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। রাজরাজ আরবদের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য কেরল নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর সুগঠিত নৌবহরের সাহায্যে সিংহলেও অভিযান করেন। সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র রাজরাজার কাছে পরাস্ত হন ও সিংহলের দক্ষিণ পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। রাজরাজ রাজধানী অনুরাধাপুর বিধ্বস্ত করেন ও চোল অধিকৃত ভূখণ্ডের রাজধানী স্থাপন করেন পোলন্নরুবতে। এখানে তিনি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন। এ ছাড়া রাজত্বের শেষের দিকে তিনি মালদ্বীপ জয় করেন। এই সিংহল জয় ও মালদ্বীপ জয় তাঁর সুগঠিত নৌবাহিনীর সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজরাজ গঙ্গ ও চালুক্যগণের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তুঙ্গভদ্রার অপর পারে অভিযান চালিয়ে তিনি গঙ্গরাজ্য মহীশুর অধিকার করে নেন। পূর্ব-উপকূলে রাজত্বকারী পূর্ব চালুক্যদের রাজধানী 'বেঙ্গী' অধিকার করে তিনি নিজ প্রতিনিধি বিমলাদিত্যকে সেখানকার সিংহাসনে বসান। বেঙ্গীতে চোলদের এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আশঙ্কিত পশ্চিম চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় বেঙ্গী আক্রমণ করেন। সত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় যুবরাজ রাজেন্দ্রকে। রাজেন্দ্র বনগসি ও রাইচুর দোয়াবের অনেকাংশ নিজ অধিকারে আনেন ও মান্যখেড ভস্মীভূত করেন। এই অবস্থায় সত্যাশ্রয় বেঙ্গী থেকে সৈন্য প্রত্যর্পণে বাধ্য হন। এইভাবে সারা রাজত্বকাল ব্যাপী সমরাভিযানের দ্বারা রাজরাজ মাদুরা, অন্ধ্র, মহীশুর ও কুর্গের কিয়দংশ, উত্তর সিংহল-সহ বেশ কিছু দ্বীপে চোল-আধিপত্য প্রসারিত করেছিলেন।

রাজরাজ চোল কেবল সাম্রাজ্য-সংগঠকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুশাসকও। শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির তাঁরই উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তবে তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কারণ সুমাত্রার রাজা শ্রীবিজয় তাঁর অনুরোধেই নেগাপতমে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। রাজত্বের শেষ দু-বছর (১০১২-১০১৪ খ্রিঃ) তিনি পুত্র রাজেন্দ্রের সাথে যুগ্মভাবে শাসন পরিচালনা করেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন চোলবংশের এক 'মহান' শাসক।

রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ) : প্রথম রাজেন্দ্র ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। কন্যাকুমারী, মহেন্দ্রগিরি ও সুত্তুর অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিসমূহ থেকে তাঁর সামরিক কীর্তির কথা জানা যায়। সিংহাসনে বসেই তিনি পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অগ্রসর হন এবং একাধিক সামরিক সাফল্যের দ্বারা চোল-শক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলেন। রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে সিংহল অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যজয়ের সূচনা করেন। অবশ্য রাজরাজের রাজত্বকালে তিনি বহু সফল সমরাভিযানে নেতৃত্ব দেন। যাইহোক্, মহাবংশ থেকে তাঁর সিংহল অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। জানা যায় যে, তিনি রাজা পঞ্চম মহেন্দ্রকে বন্দি করেছিলেন। সমগ্র সিংহল তাঁর পদানত হয়েছিল। সিংহলকে তিনি একটি চোল-প্রদেশে পরিণত করেন। নৌ-অভিযানের ক্ষেত্রে সিংহল বিজয়ই তাঁর একমাত্র সাফল্য ছিল না। তিনি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধেও নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ বিজয় তুঙ্গবর্মন রাজেন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। অবশ্য এরপর তাঁকে হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিজয়ের ফলে চিনের সাথে ভারতের বাণিজ্যপথের অন্তরায় দূর হয়।

'তিরুবালাঙ্গারু পট্ট' থেকে তাঁর রাজ্যজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে তিনি পাণ্ড্য ও কেরলদের ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর নিজপুত্রের হাতে রাজ্যগুলির শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁর পরবর্তী সংগ্রাম ছিল পশ্চিম

চালুক্যরাজ জয়সিংহের সাথে। বেঙ্গীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিমলাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিজয়াদিত্য ও রাজরাজ উভয়েই সিংহাসন দাবি করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জয়সিংহ বিজয়াদিত্যের পক্ষ নেন। অন্যদিকে রাজরাজার পক্ষ নেন রাজেন্দ্র, কারণ রাজরাজ ছিলেন চোলরাজ মহান রাজরাজার কন্যা কুন্দভাকের পুত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়সিংহই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন 'মাস্কির যুদ্ধে'। চোলদের অপর এক বাহিনী বেঙ্গীতে উপস্থিত হয়ে বিজয়াদিত্যকে হটিয়ে রাজরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। মাস্কির যুদ্ধের পর রাজেন্দ্র কলিঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। কারণ কলিঙ্গরা জয়সিংহকে সাহায্য করেছিলেন। যথারীতি কলিঙ্গরাজ রাজেন্দ্রের কাছে পরাস্ত হন।

কলিঙ্গজয়ের পর রাজেন্দ্রর সেনা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়। এই উত্তর ভারত অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় তিরুমলয় লেখ' থেকে। এই অভিযানে সময় লেগেছিল দু-বছর (১০২১-'২৩ খ্রিঃ) এবং সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়নি। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র গঙ্গাজল সংগ্রহ। পূর্ববঙ্গের শাসক গোবিচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মহীপাল ও দক্ষিণবঙ্গের রণশুর চোল বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। এই অভিযানের মাধ্যমে উত্তর ভারত, দক্ষিণের এক প্রবল সাম্রাজ্যিক শক্তির পরিচয় পায়। এই অভিযানের সাফল্যের পর রাজেন্দ্র 'গঙ্গাইকোণ্ড চোল'অর্থাৎ 'গঙ্গাবিজেতা' উপাধি নেন এবং কাবেরী নদীর তীরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এর নাম হয় 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম্'।

রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের শেষদিকে পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সম্ভবত রাজত্বের অন্তিমভাগে তিনি পশ্চিম চালুক্যগণের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবত, চালুক্যদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতে রাজেন্দ্রর মৃত্যু হয় (১০৪৪ খ্রিঃ)।

Q.: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণ দাও

বা

সিন্ধুতে আরব আক্রমণের তাৎপর্য কি ছিল

কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে সিন্ধু দেশে আরবদের বিজয় সম্ভব হয়েছিল? সেই ঘটনার তাৎপর্য কী ছিল? অথবা কীভাবে আরবরা সিন্ধু দেশ জয় করেছিল? সিন্ধুদেশে আরব শাসনের গুরুত্ব

ভূমিকাঃ রাজনৈতিক উত্থান-পতনকে যদি নদীর জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হয় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে ইসলামের জীবনকাঠির স্পর্শে আরবের মুসলমানদের মধ্যে যখন প্রাণের জোয়ার বইছিল, ইসলামের তরবারি যখন দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছিল সেই সময় থেকে আরববাসীর অদম্য ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায় " To plant the standard of the crescent and Star all over the world"। ভারতীয় রাজনীতিতে তখন ভাঁটার টান। হর্ষবর্ধনের আমলে সাম্রাজ্য গঠনের সামরিক প্রচেষ্টার পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতি কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল না। বিবেচ্য সময়ে অনৈক্য পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং আঞ্চলিক আত্মকর্তৃত্ব— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ভারতীয় রাজনীতিতে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের অনতিপূর্বে উত্তর-দক্ষিণ ভারত জুড়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে হিংসা দলাদলি পারস্পরিক স্বার্থপরতা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই রকম এক অনুকূল পরিস্থতির সুযোগ নিয়ে আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। এই সময় সিন্ধু দেশে যে রাজা রাজত্ব করছিলেন তার নাম ছিল দাহির এবং আরবদেশে তখন খলিফারা শাসন করছিলেন— যারা একদিকে ছিলেন মুসলিম জগতের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান। সিন্ধু আক্রমণের প্রাক্কালে আরবদেশে খলিফা ওয়ালিদ রাজত্ব করছিলেন। খলিফা ওয়ালিদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হজ্জাজের পরিকল্পনা অনুসারে সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশিম-র নেতৃত্বে ভারতের অন্তর্গত সিন্ধুদেশ আক্রান্ত হয়েছিল।

সিন্ধু অভিযানের কারণ : আরবদের এই সিন্ধু অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় -চাচনামা (Chuch Nama) নামে আরবি ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ থেকে। পারসিক ভাষায় যিনি এটি অনুবাদ করেছিলেন তার নাম হল মহম্মদ আলি-বিম আবুবকর। এই গ্রন্থটি